ইউনিট ৭

অভিযোগ পরিচালনা এবং শৃঙ্খলা বিধান
(Grievance Handling and Disciplinary Action)

ভূমিকা

একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে ঐ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-ব্যবস্থাপনার সম্পর্কের উপর। যদি এই সম্পর্ক ভালো হয়, তবে প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী বিষয় নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়, যার ফলে শ্রমিক-কর্মী ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে বিরোধের অর্থ হলো, দীর্ঘ মেয়াদে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি। তাই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার কাজ হচ্ছে যত শীঘ্র সম্ভব আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের অভিযোগগুলোর মীমাংসা করা এবং প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। আলোচ্য ইউনিটে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইউনিটের প্রথম পাঠে আপনি জানতে পারবেন শ্রমিকদের অভিযোগ পরিচালনা সম্পর্কে। দ্বিতীয় পাঠে বর্ণনা করা হয়েছে শৃঙ্খলা বিধান সম্পর্কে। তৃতীয় পাঠ থেকে আপনি শৃঙ্খলা বিধান মতবাদ এবং শৃঙ্খলা বিধান প্রক্রিয়ার ধাপ সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাহলে চলুন আমরা মূল আলোচনায় যাই।

পাঠ-১ : অভিযোগ পরিচালনা
(Grievance Handling)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অভিযোগ কী তা বলতে পারবেন
- অভিযোগের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- অভিযোগ পরিচালনার নীতিগুলো সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন
- অভিযোগ পরিচালনার পদক্ষেপগুলো আলোচনা করতে পারবেন
- অভিযোগ দূরীকরণের উপায়গুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

অভিযোগ পরিচালনা

কোন প্রতিষ্ঠান যত সুষ্ঠুভাবেই পরিচালিত হোক না কেন, উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মনে অসন্তোষ থাকবেই। এই অসন্তোষ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। অভিযোগ হলো এক প্রকারের অসন্তোষ। কর্মচারীদের মধ্যে নানা কারণে দুঃখ, কষ্ট, মনক্ষুন্নতা, আপত্তি অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এগুলোই সাধারণভাবে অভিযোগ নামে পরিচিত।

অভিযোগের মধ্যে কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো না থাকলে সঠিক অভিযোগ হয় না। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

- অভিযোগ কার্য বা নিয়োগ সংক্রান্ত হতে হবে
- লিখিতভাবে বা মৌখিকভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে
- আপত্তি বা অসন্তোষের আকারে পেশ করতে হবে
- অভিযোগ এমনভাবে গঠন করা হয়, যাতে তা ব্যবস্থাপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

সহজভাবে বলতে গেলে, অভিযোগ হলো নিয়োগকর্তা বা কর্মী কর্তৃক অবিচার, অন্যায়, বৈষম্য ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট অসন্তোষ, অর্থাৎ কার্য সংক্রান্ত অসন্তুষ্টিই হলো অভিযোগ।

অভিযোগের কারণসমূহ (Causes of Grievance)

- ***ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ত্রুটি-*** ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যদি সঠিক ও সুষ্ঠু হয়, তবে সেই পদ্ধতি কর্মীদের সঠিক পথে ও উত্তম পন্থায় পরিচালিত করে। এই ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি থাকলে কর্মীদের মাঝে অসন্তুষ্টি দেখা দেয়। এতে অভিযোগের সৃষ্টি হয়।
- ***নীচু মনোবল-*** নীচু মনোবল সম্পন্ন কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ বেশী। তাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয় এবং অভিযোগ দেখা দেয়।
- ***ভিন্নমত পোষন-*** ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে এবং উভয় পক্ষ নিজ নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকলে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এতে অভিযোগ সৃষ্টি হয়।
- ***চুক্তির ভাষায় অস্পষ্টতা-*** অনেক সময় চুক্তির ভাষায় বা বর্ণনায় অস্পষ্টতা থাকলে মালিক নিজ নিজ স্বার্থে চুক্তির নিজস্ব ব্যাখ্যা দানে আগ্রহী হয়। এতে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় এবং কর্মীরা অভিযোগ গঠন করে।
- ***কার্য অসন্তুষ্টি-*** নানা কারণে কাজ যদি কর্মীর মন মতো বা প্রত্যাশা অনুযায়ী না হয়, তাহলেই কার্য অসন্তুষ্টি ঘটে থাকে। যেমন- পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক পাওয়া না গেলে বা কাজের পরিবেশ প্রতিকুল হলে ইত্যাদি। এই কার্য অসন্তুষ্টি কর্মীদের ভেতর অসন্তোষের জন্ম দেয় এবং এভাবে অভিযোগের উৎপত্তি ঘটে।
- ***আইন ভঙ্গ করা-*** শ্রম আইনে শ্রমিকদের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি ব্যাপারে বিস্তারিত বিশেষণ রয়েছে। ব্যবস্থাপনা যদি বেআইনীভাবে অর্থাৎ আইনের বাইরে কোন পদক্ষেপ নেয়, তবে অভিযোগের সৃষ্টি হয়।
- ***তত্ত্বাবধায়কদের অশোভন আচরণ-*** কর্মচারীরা সব সময় ব্যবস্থাপনা থেকে ভাল আচরণ কামনা করে। তত্ত্বাবধায়করা যদি অশোভন আচরণ করেন, তবে কর্মীদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। এতে অভিযোগ দেখা দেয়।
- ***নিয়ম নীতি না মেনে চলা-*** স্বাভাবিক নিয়ম নীতি না মানার ব্যাপারটি ব্যবস্থাপনা ও কর্মী উভয়ের দিক থেকেই হতে পারে। কর্মচারীরা যখন স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না, তখনই অভিযোগ সৃষ্টি হয়।
- ***প্রয়োজনীয় সুবিধার ঘাটতি-*** প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব থাকলে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এই অসন্তোষ অভিযোগ সৃষ্টি করে।

- ***সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য-*** একই ধরনের দুইটি প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধায় বৈষম্য থাকলে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ফলে অভিযোগ দেখা দেয়।

- ***অবিশ্বাস-*** তত্ত্বাবধায়ক ও অধীনস্থ উভয়ের মধ্যে ভাল সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন এবং তা প্রতিষ্ঠানের জন্য সব দিক থেকেই মঙ্গলজনক। এক্ষেত্রে কোন ভাবেই যেন উভয়ের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি না হয় সে অনুযায়ী কাজ করা উচিত। কর্তৃপক্ষের কাজ কর্মে যদি সন্দেহ থাকে, তবে কর্মীরা অভিযোগ করে।

- ***অনুপস্থিতির হার-*** কর্মীদের অনুপস্থিতির হার বেশী হলে ব্যবস্থাপনার মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং সহকর্মীদের ভেতরও অসন্তুষ্টি দেখা দেয়। ফলে অভিযোগ দেখা দেয়।

- ***দলীয় মতামতের অবমাননা-*** অনেক সময় ব্যবস্থাপনা শ্রমিক সংঘের মতামতের মূল্য না দিয়ে নিজেদের মতামত জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়। এতে শ্রমিক সংঘের সদস্যরা ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে থাকে।

- ***স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান ভঙ্গ-*** শ্রমিক কর্মীরা কর্মস্থলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও নিরাপত্তা চায়। প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান ঠিকমত পালন করা না হলে শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং অভিযোগের সৃষ্টি হয়।

- ***উপরি কার্যের সময়-*** সময়মত কাজ না শেষ করে উপরি সময় নেয়া যদিও ঠিক নয়, তবুও এই প্রবণতা অনেক কর্মীর মধ্যে থাকে। এই দাবীকে কেন্দ্র করে অভিযোগ সৃষ্টি হয়।

- ***যৌথ দর কষাকষির চুক্তি ভঙ্গ-*** অনেক সময় কারবার প্রতিষ্ঠান যৌথ দর কষাকষির চুক্তি পালনে অস্বীকৃতি জানায় বা অনেক সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান এই প্রকারের চুক্তি পালনে অযথা বিলম্ব ঘটায়। এতে শ্রমিক সংঘের সদস্যগণ অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগ গঠন করে।

অনুশীলন
প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার পরও কর্মীদের মনে অসন্তুষ্টি বা অভিযোগ থাকার মূল কারণ কী বলে আপনি মনে করেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

অভিযোগ পরিচালনার নীতি সমূহ

প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের অভিযোগের কারণ ও উৎস সন্ধান করে, কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতিমালার উপর ভিত্তি করে অভিযোগ পরিচালনা করা হয়, অর্থাৎ সহজ কথায় অভিযোগ লাঘব করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ সমস্ত পদক্ষেপ বা নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করে অভিযোগ সমূহ দূর করা সম্ভব। কারবার প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংক্ষেপে নীচে বর্ণনা করা হল-

- ***সাক্ষাৎকারের নীতি (Principles of Interviewing)-*** যে সমস্ত কর্মীরা অভিযোগ উত্থাপন করে তাদের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অভিযোগ দূরীকরণের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে খোলাখুলিভাবে মতামত প্রকাশ করা সম্ভব হলে অভিযোগ উত্থাপনকারী কর্মচারীদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের সহযোগিতা লাভ করা যায়। সুতরাং অভিযোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কর্মচারীদের সহিত প্রয়োজনীয় আলোচনা এবং অভিযোগ সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য লাভ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- ***কর্মচারীদের সম্পর্কে ব্যবস্থাপনার মতামত-*** কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার প্রতি কর্মীদের ইতিবাচক বা গঠনমূলক মনোভাব সৃষ্টি এবং আস্থা অর্জনের জন্য একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক অবশ্যই তাঁর অধীনস্ত কর্মীদের সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য মনোভাব গঠন করবেন যা সরাসরিভাবে অভিযোগ দূরীকরণে সহায়ক। ব্যবস্থাপককে অবশ্যই কর্মীদের অভিযোগ আগ্রহের সাথে শুনতে হবে এবং সে সমস্ত সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান দিতে হবে। কর্মীদের সততার প্রতি ব্যবস্থাপকের বিশ্বাস থাকতে হবে।

- ***ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব-*** নির্বাহীদের আত্মবিশ্বাস, দায়িত্ব প্রবণতা, দায়িত্ব সচেতনতা এবং দায়িত্ব পালনের আগ্রহ কর্মীদের আস্থা ও সহযোগিতা অর্জনে সহায়ক হয়। আস্থাহীন নির্বাহীদের যোগ্যতা সম্পর্কে কর্মীরা সন্দিহান থাকে এবং তাদের যোগ্যতার প্রশ্ন উঠিয়ে তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে, যা নির্বাহীদের দক্ষতা ও সম্মানের অবমূল্যায়ন করে। সুতরাং ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও নির্বাহীদেরকে ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং অভিযোগ মোকাবেলার জন্য দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থাপনার আন্তরিক হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

- ***দীর্ঘ মেয়াদী নীতি-*** কোন কারবার প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ দূরীকরণের ব্যবস্থা শুধু সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী না হয়ে দীর্ঘকালীন হওয়া প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কর্মীদের অভিযোগ ও অসন্তোষ এড়ানোর জন্য সমগ্র প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দূরীকরণ ব্যবস্থার

সম প্রতিফলন হওয়া উচিত। অভিযোগ মোকাবিলা করতে দীর্ঘ মেয়াদী নীতির বাস্তবায়নে নিম্নে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। যেমন-

ক) দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল

খ) আস্থা হারাবার বিপদ

গ) মানবিক প্রকৃতি

ঘ) অতীতের ফলাফল

প্রত্যেক কারবার প্রতিষ্ঠানেই অভিযোগ নিস্পত্তি করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য অভিযোগ দূরীকরণের নীতিগুলো মেনে চলা উচিত, যা প্রতিষ্ঠানের অধিকতর উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।

অভিযোগ পরিচালনার পদক্ষেপসমূহ

যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিযোগ পরিচালনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিযোগ পরিচালনার জন্য সতর্কতার সঙ্গে কতগুলো পদক্ষেপ নিতে হয়। অভিযোগ পরিচালনার পদক্ষেপগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

- ***অভিযোগের বর্ণনা দান-*** অভিযোগ দূর করতে হলে প্রথমেই অভিযোগের ধরন সম্পর্কে জানতে হবে। এক এক ধরনের অভিযোগের জন্য এক এক ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। তাই সুষ্ঠু ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রথমেই অভিযোগ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

- ***তথ্য সংগ্রহ-*** অভিযোগ পরিচালনার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। অভিযোগের ধরন সম্পর্কে জানার পরের পদক্ষেপে, অভিযোগের সঙ্গে সংশিগুষ্ট সকল তথ্য যেমন- পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, অভিযোগটি কোথায় সংঘটিত হয়েছে এবং কারা এর সঙ্গে সংশিগুষ্ট ইত্যাদি জানার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। উল্লিখিত তথ্যগুলো সংগ্রহ করা গেলে হয়তোবা অভিযোগটির মূল উৎস খুঁজে বের করা সম্ভব হবে এবং এর ফলে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কোন কোন সময় দেখা যায়, সঠিক তথ্যের অভাবে অভিযোগ ঠিকমতো দূরীকরণ হয় না এবং ব্যবস্থাপনা ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়।

- ***অভিযোগের প্রাথমিক সমাধান প্রদান-*** অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংগ্রহের পর প্রাথমিক সমাধান দিতে হয়। এই পর্যায়ে কয়েকটি বিকল্প সমাধানও দেয়া যায়। তবে এ সকল সমাধান হতে কোন প্রকারের ফলাফল পাওয়া যেতে পারে তা দেখার জন্য কিছু সময় অপেক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুরূপক্ষেত্রে গৃহীত সমাধানও প্রয়োগ করা যায়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অনুরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তাও বিশেগুষণ করা যায় কি না তা বিবেচনা করতে হবে।

- ***প্রাথমিক সমাধান যাচাই-*** এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীগণ প্রাথমিক সমাধানের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে থাকেন। এটা অনেকটা ল্যাবরেটরীতে পরিচালিত পরীক্ষা নিরীক্ষার মতোই। এতে প্রাথমিক সমাধানটিকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে বিশেগুষণ সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে দুইটি সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। প্রথমত নির্বাহীগণ 'পরখ ও ভ্রান্তি' পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে পারেন। দ্বিতীয়ত অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করা যেতে পারে। প্রাথমিক সমাধান যাচাইয়ের উদ্দেশ্য হলো ভুলত্রুটি চিহ্নিত করে সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

- ***সমাধান প্রয়োগ-*** যাচাই পর্ব শেষ হওয়ার পর গৃহীত সমাধান প্রয়োগ করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। এই পর্যায়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, কারণ অভিযোগ দূর করার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যেমন কঠিন, তা প্রয়োগ করাটা আরও কঠিন।

- ***অনুগমন-*** এটা অভিযোগ পরিচালনার সর্বশেষ পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে অভিযোগ পরিচালনা কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা যাচাই করা হয় । অভিযোগ হ্রাস পেল কি না? কী পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে? অনুগমন করার পদ্ধতি হলো (ক) পর্যবেক্ষণ; (খ) ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত সম্মন্ধে কর্মীদের মতামত; (গ) কর্মীদের সাথে সাধারণ আলোচনা; (ঙ) কর্মীদের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে অন্যদের মতামত জানা।

সবশেষে বলা যায়, কর্মীদের কর্ম অসন্তুষ্টি লাঘব করার উদ্দেশ্যে অভিযোগ পরিচালনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলন

প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার অভিযোগের ক্ষেত্রেই কি উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করা সম্ভব? কেন বা কেন নয়? ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-২: শৃঙ্খলা বিধান (Disciplinary Action)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শৃঙ্খলা বিধান কী সে সম্পর্কে বলতে পারবেন
- শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সমস্যার বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- বিশৃঙ্খলার কারণ সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শৃঙ্খলা বিধানের সময় বিবেচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তার কর্মীদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে চায় যাতে তারা উন্নত মান বজায় রেখে কাজ করতে পারে এবং একই সাথে কার্য সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে অনেক প্রতিষ্ঠান কর্মী নির্বাচন, তাদের কার্য বিশেশুষণ, কার্য-সম্পাদনের মান নির্ধারণ এবং পুরস্কার প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামর্থ্য অনুসারে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা প্রদান করতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে এমন কিছু কর্মী আছে যারা কর্মীদের জন্য যাই করা হোক না কেন, সব সময় ব্যবস্থাপনার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট থাকে। এই সমস্ত কর্মী যে ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে তাহলো, সব সময় দেরীতে অফিসে বা কাজে আসা, প্রায়ই কাজে অনুপস্থিত থাকা, সহ-কর্মীদের সঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি, আদেশ অমান্য করা, নিরাপত্তার রীতি ভঙ্গ করা, অথবা এমন কোন কাজে জড়িয়ে যাওয়া যা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়। এই সমস্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ সময়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, আর তা হলো শৃঙ্খলা বিধান করার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি যেন আইনানুগ হয়।

একজন কর্মী কেন বিশৃঙ্খলা করবে তার নির্দিষ্ট কোন কারণ নাও থাকতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কারণ বেশ কয়েকটি রয়েছে। আবার এটাও বলা শক্ত হবে যে, শৃঙ্খলা বিধানের মাধ্যমে কর্মীদের অযৌক্তিক আচরণ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা যাবে। তবে শৃঙ্খলা বিধান কার্যক্রমের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠান ভালো ফল পেয়ে থাকে।

শৃঙ্খলা বলতে কী বুঝায়? শৃঙ্খলা বলতে আমরা বুঝি যে, কতগুলি বাঁধা নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালন করা এবং একই সাথে কাজের সময় সহযোগিতামূলক, সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক আচরণ করা যা একটি প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত আচরণ সম্পর্কিত রীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মীরাই আত্ন-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিজেদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। অর্থাৎ তারা প্রত্যাশিত আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করে, কারণ তারা মনে করে যে ঐ আচরণ করাই যুক্তিযুক্ত। কর্মীরা যদি বুঝতে পারে তাদের কাছে কোন ধরনের আচরণ আশা করা হচ্ছে এবং যদি তারা মনে করে যে এই প্রত্যাশা যুক্তিসঙ্গত, তাহলে তারা এই প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট থাকে।

কিন্তু অনেক কর্মী আত্ন-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিজেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে না। উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমেও তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বোধ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। ফলে প্রত্যাশিত আচরণ প্রদর্শনে ব্যর্থ এই সমস্ত কর্মীদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে আমরা শৃঙ্খলা বিধান বলি। এই পাঠে এবং পরবর্তী পাঠে আমরা শৃঙ্খলা বিধান কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করবো। প্রথমে আলোচনা করবো কী কী ধরনের শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সমস্যার উদ্ভব হতে পারে।

অনুশীলন

উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমে কোন কোন কর্মীর মধ্যে শৃঙ্খলা বোধ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না কেন? ব্যাখ্যা করুন।

শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সমস্যার ধরন
(Types of Problems relating to Discipline)

যদি কোন ব্যবস্থাপককে কী কী ধরনের শৃঙ্খলা জনিত সমস্যা আছে তার তালিকা দিতে বলা হয়, তাহলে হয়তো ডজনখানেক সমস্যা সম্পর্কিত তালিকা তার কাছ থেকে পাওয়া যাবে। বুঝার সুবিধার জন্য আমরা চারটি প্রধান সমস্যা নিয়ে নিচে আলোচনা করছি-

- ***কাজে অনুপস্থিতি-*** ব্যবস্থাপকদের জন্য একটি বড় সমস্যা হলো কর্মীদের কাজে অনুপস্থিতি। একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীর জন্য কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। কর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে। যদি একজন কর্মী কাজে অনুপস্থিত থাকেন, তবে প্রতিষ্ঠানের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। সাময়িকভাবে হয়তো অন্য কাউকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু কর্মী দীর্ঘদিন বা ঘন ঘন অনুপস্থিত থাকলে তা ব্যবস্থাপক ও প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাপক সমস্যা হিসাবে দেখা দিতে পারে। কর্মী কেন ঘন ঘন কাজে অনুপস্থিত থাকে? এই প্রশ্নের সরাসরি বা যথাযথ উত্তর পাওয়া একটু কঠিন, তবে বেশ কয়েকটি কারণ আমরা পেতে পারি। প্রথমত, অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রাতষ্ঠানিক লক্ষ্যের সঙ্গে কর্মীর লক্ষ্যের কোন সামঞ্জস্য থাকে না। কর্মী যখন কাজের সঙ্গে বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না, তখন তার কাজে উপস্থিতির হার কমে যায়। দ্বিতীয়ত, কর্মীদের কাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। অনেক কর্মীর ক্ষেত্রে তাদের কাজ তাদের জীবনের একমাত্র আকর্ষণ নয়। ফলে, যথাযথ সময়ে কাজে উপস্থিত হওয়া তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয় না।

তৃতীয়ত, একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা বা পটভূমি (Background) ভিন্ন হয়। একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পটভূমির ব্যক্তিবর্গ কাজ করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি কর্মজীবনে প্রবেশ করছেন। এদের অনেকের অভিজ্ঞতার পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং মূল্যবোধ ও কাজে উপস্থিতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। তাদের অনেকের কাছে কাজই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নয়। চতুর্থত, অনেক কর্মী মনে করেন যে নৈমিত্তিক ছুটি, ঐচ্ছিক ছুটি, অর্জিত ছুটি এইগুলির সুবিধা যখন দেওয়া হয়েছে তখন এই সুবিধা তারা ভোগ করবেন না কেন। ফলে কোন কারণ ছাড়া ঐ সমস্ত ছুটি গ্রহণ করে তারা কাজে অনুপস্থিত থাকেন। এই সমস্ত অনুপস্থিতি জনিত সমস্যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকট এবং ব্যবস্থাপকের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে। একই সাথে বিষয়টি মানব সম্পদ বিভাগের জন্যও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। চাকুরীতে নিয়োগ কালে কর্মীর অতীত চাকুরী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কর্মীর এই সমস্যা রয়েছে কিনা তা কিছুটা জানতে পারেন।

- ***কাজের অভ্যন্তরে আচরণ-*** দ্বিতীয় শৃঙ্খলাজনিত সমস্যাটি সৃষ্টি হতে পারে কাজের অভ্যন্তরে কর্মীর আচরণ থেকে। এই ধরনের সমস্যার মধ্যে রয়েছে আবাধ্যতা, কাজে হৈ চৈ সৃষ্টি, সহকর্মীদের সঙ্গে বিবাদ, কাজে নিরাপত্তার নিয়ম না মানা, অসর্তকতা, অর্পিত কাজ যথাসময়ে শেষ করার ক্ষেত্রে অলসতা ইত্যাদি। এই সমস্ত আচরণ প্রতিষ্ঠানের আইন সরাসরি ভঙ্গের সামিল। যেমন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ আমান্য করা কিংবা সহকর্মীদের সংগে ঝামেলা সৃষ্টি করা কার্যক্ষেত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ। যেহেতু এই সমস্ত আচরণ প্রতিষ্ঠানের জন্য গ্রহণযোগ্য আচরণ নয়, সেহেতু এই সমস্ত শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য কর্মীর বা কর্মীদের বিপক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

- ***কাজে অসৎ আচরণ-*** কাজে অসৎ আচরণের জন্য অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রাখে। পাশ্চাত্যে আজকাল 'সততার পরীক্ষা' নামে একটি পরীক্ষা চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান জানতে পারে একজন কর্মীর আচরণে অসৎ হওয়ার প্রবণতা কতটা।

  একজন কর্মী যদি তার কর্মী জীবনে একবারও অসৎ আচরণ প্রদর্শন করেন, তা হলেই তিনি চিরদিনের জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তির তালিকায় থাকবেন। ভুল হোক বা ঠিক হোক, এটা ধরে নেওয়া হয় যে, যিনি একবার অসৎ হতে পেরেছেন তার আরো অসৎ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠান ঐ কর্মীকে বা কর্মীদেরকে কিছুটা আলাদা করে দেখতে পারে।

- ***কাজের বাইরের কার্যক্রম-*** কার্য ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাজনিত সমস্যার তালিকায় এমন কিছু কাজ আছে যা কর্মী কাজের বাইরে করেন, কিন্তু ঐগুলি তার কাজকে প্রভাবিত করে এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণাত্মক ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে। যেমন, আইন বহির্ভূত ধর্মঘট, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করা। এছাড়া ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মী কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের দূর্নাম করা কিংবা প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ সম্পর্কে যে কোন স্থানে প্রশ্ন তোলাও এই ধরনের শৃঙ্খলাভঙ্গ জনিত সমস্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

একজন কর্মী তার কার্যক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে ৪০ থেকে ৫০ ঘন্টা অবস্থান করেন; কিন্তু তার বাহ্যিক কাজ যদি প্রতিষ্ঠানকে বিব্রত করে, তাহলে প্রতিষ্ঠান তার বিপক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই ধরনের সমস্যা সাধারণত ব্যবস্থাপক স্তরে কর্মরত কর্মীদের মধ্যে দেখা যায়।

অনুশীলন

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অন্ততঃ পাঁচটি শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সমস্যা উল্লেখ করুন এবং তা উপরের কোন শ্রেণীতে পড়ে তা চিহ্নিত করুন।

বিশৃঙ্খলার কারণ সমূহ (Causes of Indiscipline)

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কম বেশী শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা রয়েছে, তবে বিশৃঙ্খলা যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্যই অনভিপ্রেত। তবুও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং এই বিশৃঙ্খলার কারণ সমূহ নিচে আলোচনা করা হলো-

- ***উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দূর্ব্যবহার-*** প্রতিটি কর্মীই তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে যথাযথ ব্যবহার আশা করেন। কারণ ভালো ব্যবহার একজন কর্মীকে ভালো কাজে উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যদি প্রতিনিয়ত খারাপ ব্যবহার করেন তাহলে কর্মীর মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হতে পারে। এর ফলে এক সময় কর্মীর মধ্যে নিয়ম ভাঙ্গার প্রবণতা দেখা যায়।

- ***চাপা ক্ষোভ-*** একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকতে পারে। এই সমস্ত সমস্যার অধিকাংশগুলি তাদের কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অনেক সময় দেখা যায় যে, কর্মীরা সমস্যা সম্পর্কে ব্যবস্থাপককে জানাচ্ছেন, কিন্তু কোন ধরনের প্রতিকার বা সহানুভূতি পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে কর্মীদের মনে চাপা ক্ষোভের জন্ম হয় এবং তারা বিশৃঙ্খল আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

- ***চাকুরী জনিত সমস্যা-*** একজন কর্মী যখন চাকুরীতে যোগদান করেন, তখন তার মধ্যে স্বাভাবিক আশা থাকে ন্যায্য বেতন ও মজুরী পাওয়ার, পদোন্নতি পাওয়ার এবং কাজের সুন্দর পরিবেশ পাওয়ার। যখন সে ন্যয্য বেতন পায় না, কাজের সুন্দর

পরিবেশ পায় না এবং দেখতে পায় যে পদোন্নতির ক্ষেত্রে নিয়ম কানুন মানা হচ্ছে না, তখন তার মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং এতে করে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়।

- ***ব্যবস্থাপকের স্বেচ্ছাচারিতা-*** কর্মীরা ব্যবস্থাপকের যুক্তিসঙ্গত আচরণ আশা করেন, কারণ ব্যবস্থাপকই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধনের দায়িত্বে নিয়োজিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক স্বেচ্ছাচারী আচরণ প্রদর্শন করেন, সাধারণ নিয়ম কানুন অনুসরণ করেন না। ফলে কর্মীরা তিক্ত বিরক্ত হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়।
- ***নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অজ্ঞতা-*** অনেক প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের সঙ্গে ব্যবস্থাপনার যোগাযোগের পরিমাণ সীমিত। এর ফলে ব্যবস্থাপনার নির্ধারিত অনেক নিয়মকানুন সম্পর্কে কর্মীরা অজ্ঞ থাকে। এর ফলে কোন কাজ করলে নিয়ম শৃঙ্খলা ভাঙ্গা হবে তা তারা জানতে পারে না এবং কর্মীরা অজ্ঞতার জন্য শৃঙ্খলা ভঙ্গ জনিত অনেক কাজ করে ফেলে।
- ***ট্রেড ইউনিয়নের প্ররোচনা-*** যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ আছে, সে ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন অনেক সময় শ্রমিকদেরকে বিশৃঙ্খল আচরণে প্ররোচিত করে। এই প্ররোচনার কারণ শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে আবার ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যও হতে পারে। তবে ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক প্ররোচনার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার মাত্রা ব্যাপক হয়।

অনুশীলন

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সমস্যার পাঁচটি প্রধান কারণ উল্লেখ করুন এবং এর ফলে কী ধরণের সমস্যা হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

শৃঙ্খলা বিধান কাজে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
(Considerable Factors in Disciplinary Action)

ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে আপনি জেনেছেন যে, প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা রয়েছে, যে জন্য শৃঙ্খলা বিধানের প্রয়োজন হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের দেখতে হবে এই বিশৃঙ্খলা বা আইন ভঙ্গের প্রবণতা বা মাত্রা কতটুকু। উপর্যুক্ত শৃঙ্খলা বিধান কার্য পরিচালনার উদ্দেশে শৃঙ্খলা বিধান কার্যের পূর্বে কতগুলি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। নিচে এই বিবেচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

- ***সমস্যার গভীরতা-*** সমস্যা কতটা মারাত্মক তা বিবেচনা করতে হবে। যেমন, কাজে ২০ মিনিট দেরী করে আসা, এই সমস্যা থেকে প্রতিষ্ঠানের ৫০,০০০/= টাকা আত্মসাৎ করা অনেক বেশী মারাত্মক সমস্যা।
- ***সমস্যার দৈর্ঘ্য-*** অতীতে কোন শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা হয়েছে কিনা এবং হলে তার স্থায়িত্ব কত দিনের ছিলো তা বিবেচনা করতে হবে। প্রথম শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত অপরাধকে তৃতীয় বা চতুর্থ বারের অপরাধ থেকে একটু ভিন্নভাবে দেখা হয়।
- ***সমস্যার পৌনঃপৌনিকতা এবং প্রকৃতি-*** একটি প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে যে শৃঙ্খলা ভঙ্গের সমস্যা রয়েছে, তা অতীতে সংঘটিত কোন আইন ভঙ্গ জনিত ঘটনা থেকে উদ্ভব হয়েছে কিনা তা বিবেচনায় আনতে হবে। সমস্যার স্থায়িত্ব দেখলেই চলবে না, এর প্রকৃতিও দেখতে হবে। ক্রমাগত শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনাকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে।
- ***সমস্যা প্রশমিত করার উপায়ের উপস্থিতি-*** সমস্যা প্রশমিত করার মত উপায় উপস্থিত ছিল কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। একজন কর্মী কাজে আসতে পারেনি, কারণ তার বাবা মারা গেছেন। এই ঘটনা যতটা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হবে, ঘুম থেকে দেরিতে উঠার জন্য অফিসে অনুপস্থিতির ঘটনা সেভাবে বিবেচনা করা হবে না।
- ***প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম সম্পর্কে কর্মীদের জ্ঞান-*** কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুন জানানোর জন্য ব্যবস্থাপনা কোন ধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে তা বিবেচনায় আনতে হবে। এছাড়া আইন কানুন ভঙ্গ জনিত শাস্তি কী হবে, তা কর্মীরা অবগত কিনা তাও বিবেচনা করতে হবে। শাস্তির মাত্রা কতটা হবে তা নির্ভর করবে প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্য আচরণ সম্পর্কে আইন ভঙ্গকারীর জ্ঞানের উপর। একজন নুতন কর্মী প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি যতটা জানবেন দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত কর্মী অবশ্যই অনেক বেশী জানবেন।
- ***শৃঙ্খলা বিধান সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের অতীত কার্যক্রম-*** একই ধরনের আইন ভঙ্গজনিত অপরাধের জন্য অতীতে প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল তা আরেকটি বিবেচ্য বিষয়। এছাড়াও শৃঙ্খলা বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা তাও বিবেচনা করতে হবে। একই ধরনের অপরাধের জন্য একই ধরনের শাস্তির বিধান প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগে এবং সার্বিকভাবে সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানে থাকতে হবে।
- ***যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে-*** শাস্তি প্রাপ্ত কর্মী যদি তার বিষয়টি আরো উচ্চতর ব্যবস্থাপনার নিকট উপস্থাপন করতে চায়, তাহলে শাস্তি প্রদানকারী ব্যবস্থাপকের নিকট ঘটনা সম্পর্কে যথাযথ প্রমাণ আছে কিনা তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। একজন কর্মী যদি তার তত্ত্বাবধায়ক প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে উচ্চ ব্যবস্থাপনায় আপিল করে, সেক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত যথাযথ হলে এবং পর্যাপ্ত তথ্য দ্বারা সমর্থিত হলে, উচ্চ ব্যবস্থাপনাও ঐ সিদ্ধান্তকে মেনে নেবে। যদি আইন ভঙ্গকারী মনে করে যে, শাস্তির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে এবং বাতিল করা সম্ভব হবে, তবে ঐ সিদ্ধান্তের কোন মূল্য বা প্রভাব থাকবে না।

পাঠ- ৩ : শৃঙ্খলা বিধান মতবাদ এবং প্রক্রিয়া
(Approaches and Processes of Disciplinery Action)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শৃঙ্খলা বিধান মতবাদ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- শৃঙ্খলা বিধান প্রক্রিয়ার ধাপগুলির বর্ণনা দিতে পারবেন
- বাংলাদেশে শৃঙ্খলা বিধান সংক্রান্ত আইনের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

শৃঙ্খলা বিধান মতবাদ (Approaches to Disciplinary Action)

পূর্ববর্তী পাঠের আলোচনা থেকে আপনি জেনেছেন যে, শৃঙ্খলা ভঙ্গ জনিত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীর সাথে এককভাবে আলোচনার মাধ্যমে তাকে তার অপরাধ সম্পর্কে বুঝিয়ে ভবিষ্যতে শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য প্রতিশ্রুতি আদায় করা যায়। আবার সর্বসমক্ষে ভৎসনা, শাস্তি প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এমতাবস্থায় সমস্ত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে শৃঙ্খলা বিধান কাজে বিশেষ মনোযোগী হতে হয়, যাতে কোন ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে। শৃঙ্খলা বিধানের তিনটি মতবাদ রয়েছে। নিচে এই গুলি আলোচনা করা হলো-

- ***শৃঙ্খলা বিধান- শাস্তিমূলক হওয়ার চাইতে সংশোধনমূলক হওয়া উচিত (Diciplinary Action - Corrective Rather than Punitive)-*** এই মতবাদে বলা হয়েছে যে, শৃঙ্খলা বিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য শাস্তি প্রদান হতে পারে না। এর উদ্দেশ্য হলো কর্মীর বা কর্মীদের অপ্রত্যাশিত আচরণ সংশোধন করা। শাস্তি প্রদান কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে আসল উদ্দেশ্যটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

- ***শৃঙ্খলা বিধান- প্রগতিশীল মতবাদ (Disciplinary Action- Progressive Approach)-*** পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে যথাযথ শৃঙ্খলা বিধান এর ধরন বিভিন্ন হতে পারে, তবে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, শৃঙ্খলা বিধান প্রগতিশীল হবে। এই মতবাদ অনুসারে প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী সর্বোচ্চ অপরাধের জন্যই শুধুমাত্র একজন কর্মীকে বরখাস্ত করা উচিত। প্রগতিশীল মতবাদ অনুসারে, প্রথমে অপরাধীকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে দিতে হবে, এরপর লিখিত ভাবে সতর্ক করে দেওয়া, বরখাস্তকরণ এবং একেবারে মারাত্মক বা অমার্জনীয় অপরাধের জন্য চাকুরীচ্যুত করা যাবে।

- ***শৃঙ্খলা বিধান- উত্তপ্ত ষ্টোভ মতবাদ (Disciplinary Action - The Hot Stove Approach)-*** শৃঙ্খলা বিধান কার্যের সঙ্গে উত্তপ্ত ষ্টোভ স্পর্শ করার মধ্যে একটা স্বাদৃশ্য রয়েছে। গরম ষ্টোভ স্পর্শ করলে তাৎক্ষনিক ভাবে ফল পাওয়া যায়, অর্থাৎ হাত পুড়ে যায়। ষ্টোভ স্পর্শ করলে কি হবে তাও জানা হয়ে যায় এবং এ বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। ফলাফল যা পাওয়া যায় তা সব সময়ই সঙ্গতিপূর্ণ অর্থাৎ উত্তপ্ত উনান ধরলেই হাত পুড়বে। সর্ব শেষ বিষয়টি হলো, একজন মানুষ, তা সে যেই হোকনা কেন, যদি উত্তপ্ত ষ্টোভ স্পর্শ করে তবে তার হাত পুড়ে যাবেই, অর্থাৎ ঘটনাটির একটি নৈর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য আছ।

  এবার উপর্যুক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যকে শৃঙ্খলা বিধান কাজের ক্ষেত্রে চিন্তা করা যাক। শৃঙ্খলা ভঙ্গ জনিত অপরাধের বিচার সঙ্গে সঙ্গে হওয়া প্রয়োজন এবং শাস্তি বিধানও তাৎক্ষণিকভাবে হতে হবে। তা হলে কর্মী নিশ্চিত হবে যে, তার অপরাধের জন্যই তাকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠানের রীতিনীতি এবং আইন-কানুন সম্পর্ক যথাযথ জ্ঞান দেওয়ার জন্য ব্যবস্থাপনাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও কোন ধরনের আচরণ প্রতিষ্ঠানে গ্রহণযোগ্য, শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য কী ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে সে সম্পর্কেও কর্মীদেরকে জানাতে হবে, যাতে তারা আগে থেকেই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শৃঙ্খলা বিধান কার্যক্রম কর্মীদের কাছে তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন কর্মীদের আইন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি সম্পর্কে তারা অবগত থাকবে।

শৃঙ্খলা বিধান কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকতে হবে। যদি শাস্তি প্রদানের মধ্যে সঙ্গতি না থাকে তবে আইন কানুনের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাবে। এতে কর্মীদের মনোবল হ্রাস পাবে এবং কর্মীরা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। এর ফলে উৎপাদনশীলতাও হ্রাস পাবে। সব কর্মীই একটি আচরণকে কোন স্তর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য আচরণ বলা হবে, তা ব্যবস্থাপনার কাছে জানতে চায়। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, একটি প্রতিষ্ঠানে শামীম নামে একজন কর্মী আছেন। কোন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কোন একটি শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হলো। অথচ ঠিক আগের সপ্তাহে একই অপরাধের জন্য সে কোন শাস্তি পায়নি। আবার একই অপরাধের জন্য একজন কর্মী শাস্তি পেলেন কিন্তু অন্যজন বেঁচে গেলেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিধান কাজের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়। তাই শৃঙ্খলা বিধান সর্বক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এই মতবাদের সর্বশেষ বিবেচ্য বিষয় হলো শৃঙ্খলা বিধান কাজে

নৈর্ব্যক্তিক হতে হবে। একজন কর্মীকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তি প্রদান করা যাবে, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। অর্থাৎ কর্মী তার অপরাধের জন্যই শুধুমাত্র শাস্তি পেতে পারে। অভিযুক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর তার সঙ্গে আগের মতই আচরণ করতে হবে। তা না হলে শৃঙ্খলা বিধানের নৈর্ব্যক্তিকতা থাকবে না।

উপরের চারটি বিষয়ই উত্তপ্ত ষ্টোভ মতবাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

অনুশীলন
শৃঙ্খলা বিধানের মতবাদগুলি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কর্মীদেরও মানবাধিকার বা স্বার্থকে কীভাবে সংরক্ষণ করেছে তা চিহ্নিত করুন।

শৃঙ্খলা বিধান প্রক্রিয়া (The Process of Disciplinary Action)

শৃঙ্খলা বিধান প্রক্রিয়ার ছয়টি ধাপ রয়েছে : লিখিত মৌলিক সতর্কতা, লিখিত সতর্কতা, বরখাস্ত, পদাবনতি, বেতন বা মজুরী কর্তন, চাকুরী চ্যুতি। এই ছয়টি ধাপের মধ্যে পদাবনতি ও বেতন বা মজুরী কর্তন এই দু'টি ধাপ ঘন ঘন ব্যবহার করা হয় না, তবে এই দু'টি ধাপের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে এই ছয়টি ধাপ আলোচনা করা হলো-

- ***লিখিত মৌখিক সতর্কীকরণ (Written Verbal Warning)-*** শৃঙ্খলা বিধান কাজের সবচেয়ে নরম ধরনের শাস্তি হলো লিখিত মৌখিক সতর্কীকরণ। এটি প্রথম ধাপ। শৃঙ্খলাভঙ্গ জনিত কারণে ব্যবস্থাপক কর্মীকে যে মৌখিক ভর্ৎসনা করেন ব্যবস্থাপক তা লিখিত ভাবে নিজস্ব কর্মী ফাইলে রাখেন। এই পদ্ধতিকে লিখিত মৌখিক সতর্কীকরণ বলে এবং এই রেকর্ড একটি সাময়িক রেকর্ড যা শুধুমাত্র ব্যবস্থাপকদের কাছে থাকে। লিখিত মৌখিক সতর্কীকরণে কর্মীর সঙ্গে শৃঙ্খলা ভঙ্গ জনিত কারণে ব্যবস্থাপক যে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করেন তার উদ্দেশ্য, তারিখ, ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হয়। মৌখিক সতর্কীকরণের সঙ্গে লিখিত মৌখিক সতর্কীকরণের পার্থক্য হলো, মৌখিক সতর্কীকরণে শুধু মৌখিকভাবে কর্মীকে সতর্ক করা হয়। কিন্তু শৃঙ্খলা বিধানের প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য মৌখিক সতর্কীকরণের লিখিত রূপ প্রয়োজন। লিখিত মৌখিক সতর্কীকরণে মৌখিক সতর্কীকরণের লিখিত রূপটি থাকে, এবং এটি ব্যবস্থাপকের কর্মী সংক্রান্ত নথিতে সাময়িকভাবে রেকর্ডভুক্ত করা হয়।

  লিখিত মৌখিক তিরস্কার কার্যকর হবে যদি তা কর্মীকে এককভাবে এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপক কর্মীকে জানাবে যে, কর্মী কোন আইন-কানুন ভঙ্গ করেছে এবং এই শৃঙ্খলা-ভঙ্গজনিত কারণে কী সমস্যার সৃস্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, একজন কর্মী প্রায় এক মাস প্রতিদিনই দেরী করে অফিসে এলেন। তার অফিসে আসার সময় সকাল ৮টা। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক প্রথমে তাকে অফিসে আসার প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময় সম্পর্কে জানাবেন এবং তার অফিসে দেরী করে আসার জন্য অন্যান্য কর্মীদের কাজের চাপ কীভাবে বাড়ছে এবং বিভাগের মনোবল কীভাবে হ্রাস পাচ্ছে তা ব্যাখ্যা করবেন। সমস্যার যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের পর ব্যবস্থাপক কর্মীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবেন।

  কর্মী তার নিজ সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শনের পর ব্যবস্থাপক চিন্তা করে দেখবেন যে, যুক্তিগুলি গ্রহণযোগ্য কিনা। যদি যুক্তি গ্রহণযোগ্য না হয়, তখন ব্যবস্থাপক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় বক্তব্য দিবেন বা সতর্ক করে দিবেন যাতে পুনরায় এই ধরনের সমস্যা না হয়। সমাধানের উপায় ঠিক হলে, ব্যবস্থাপক কর্মীকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবেন ভবিষ্যতে একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি হলে কী ধরনের অবস্থায় কর্মীকে পড়তে হবে।

  যদি লিখিত মৌখিক সতর্কীকরণ কার্যকর হয়ে তবে আর কোন শৃঙ্খলা বিধানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু অকার্যকর হলে পরবর্তীতে আরো কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে।

- ***লিখিত সতর্কীকরণ (Written Warning)-*** শৃঙ্খলা বিধান কাজের দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে লিখিত সতর্কীকরণ। সত্যিকার অর্থে এই ধাপটি থেকেই আনুষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বিধান কার্যক্রম চালু হয়। কারণ, কর্মীকে লিখিত সতর্কীকরণ প্রদান করা হলে আরেকটি কপি মানব সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়, যা কর্মীর স্থায়ী ব্যক্তিগত নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। লিখিত সতর্কীকরণ প্রদানের পূর্বে যে কাজগুলি করা হয় তা অনেকটা লিখিত মৌখিক সতর্কীকরণ ধাপের অনুরূপ। যেমন, কর্মীর সঙ্গে একক ভাবে তার শৃঙ্খলা ভঙ্গ জনিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, এর ফলাফল কী হলো তা জানানো হয় এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের অপরাধের জন্য কী শাস্তি হবে তা ব্যাখ্যা করা হয়। পার্থক্য হলো যে, এই ধাপে অতঃপর কর্মীকে জানানো হয় যে, তাকে একটি আনুষ্ঠানিক লিখিত সতর্কীকরণ পত্র দেওয়া হবে। এর পর ব্যবস্থাপক চিঠিটি তৈরী করেন যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে - সমস্যার প্রকৃতি, যে আইন ভঙ্গ করা হয়েছে তার বিবরণ কর্মী নিজে কোন সংশোধন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করল কি না তার বিবরণ, এবং পরবর্তীতে একই অপরাধ সংঘটিত হলে কি ধরনের শাস্তি হবে তার ব্যাখ্যা। এবার ব্যবস্থাপক এই চিঠির একটি কপি কর্মীকে এবং অপর একটি কপি মানব সম্পদ বিভাগে বা কর্মী বিভাগে প্রেরণ করেন।

- ***বরখাস্তকরণ (Suspension)-*** বরখাস্তকরণ শৃঙ্খলা বিধান কাজের পরবর্তী ধাপ এবং এটি অনুসরণ করা হয় পূর্ববর্তী ধাপগুলি ব্যবহার করে যদি আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লিখিত মৌখিক সতর্কীকরণ এবং লিখিত সতর্কীকরণ প্রয়োগ না করে সরাসরি কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়, যদি কর্মী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের মাত্রা মারাত্মক হয়।

  বরখাস্তকরণ একদিন বা কয়েক সপ্তাহের জন্য করা যেতে পারে। বরখাস্তকরণের অংশ হিসাবে কর্মীকে বা কর্মীদেরকে লে-অফ করে দেওয়া হতে পারে, যা এক মাসের বেশী হয় না। অনেক প্রতিষ্ঠান এই ধাপটি এড়িয়ে যায়, কারণ অনেক ক্ষেত্রে কর্মী এবং প্রতিষ্ঠান উভয়ের জন্য এটা ক্ষতিকর বিবেচিত হয়। প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে বরখাস্ত করা মানে হলো, ঐ বিশেষ কর্মী বা কর্মীদের কাজ থেকে প্রতিষ্ঠানের বঞ্চিত হওয়া। যদি ঐ কর্মীর বিশেষ দক্ষতা থাকে বা একটি জটিল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যদি সে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে থাকে, তবে কাজে তার অনুপস্থিতি উৎপাদনকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করতে পারে, যদি যথাযথ বিকল্প কর্মী না পাওয়া যায়। কর্মীর দৃষ্টিকোণ থেকে, বরখাস্ত মানে তার মনোবল হ্রাস এবং কাজে হতাশা সৃষ্টির সম্ভাবনা।

  উপর্যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠান বরখাস্তকরণ পদ্ধতিটি গ্রহণ করে। কারণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মনে করে যে, সমস্যা সংকুল কর্মীদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে ফিরিয়ে আনতে বরখাস্তকরণ পদ্ধতি কাজ দেয়।

- ***পদাবনতি (Demotion)-*** বরখাস্তকরণ পদ্ধতিটি যদি ব্যর্থ হয় এবং প্রতিষ্ঠান যদি তারপরও অপরাধী কর্মীকে চাকুরীচ্যুত করতে না চায়, তবে পদাবনতি পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান শৃঙ্খলাভঙ্গ জনিত কারণে শাস্তিস্বরূপ পদাবনতি পদ্ধতি কমই ব্যবহার করে, কারণ এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র অপরাধী কর্মীকেই মনোবলহীন করে না, একই সাথে কর্মীর সহকর্মীদেরকেও মনোবলহীন করতে পারে। আরো একটি দিক হলো, বরখাস্তকরণের মত এটি অস্থায়ী ব্যবস্থা নয়। ফলে পদাবনতি প্রাপ্ত ব্যক্তি সবসময় অন্তর্জ্বালায় ভুগতে থাকে যা তার প্রেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করে।

  শৃঙ্খলা বিধান কাজের জন্য যদি পদাবনতি ব্যবহার করা হয়, তাহলে তিনটি উপাদান উপস্থিত থাকতে হবে-

  ১) কর্মীকে যে পদে পদাবনতি দেওয়া হবে সেই পদের কাজ সম্পন্ন করার সামর্থ তার আছে
  ২) কর্মীকে চাকুরীচ্যুত করার বিষয়ে ব্যবস্থাপনার নীতিগত বা আইনগত বাধা আছে
  ৩) পদাবনতি সমস্যা সংকুল কর্মীকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করবে

উল্লিখিত তিনটি উপাদানের উপস্থিতিতে পদাবনতি প্রদান করলে কর্মী বুঝতে পারে যে, সে যদি তার আগের অবস্থা ফিরে পেতে চায় তবে নিজকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করতে হবে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে। তাকে আরো বুঝাতে হবে যে, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিয়ত প্রাতিষ্ঠানিক আইন ভঙ্গজনিত কাজকে উপেক্ষা করবে না। তবে পদাবনতি পদ্ধতিটি সাধারণত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় না। বিশেষত ব্যবস্থাপনা এবং পেশাজীবি কর্মীদের ক্ষেত্রে পদাবনতি পদ্ধতির ব্যবহার খুবই কম।

- ***বেতন বা মজুরী কর্তন (Pay Cut)-*** আরেকটি কদাচিৎ ব্যবহৃত শৃঙ্খলা বিধান কাজের ধাপ রয়েছে, যার নাম হলো বেতন বা মজুরী কর্তন। এই পদ্ধতিতে সমস্যা সৃষ্টিকারী কর্মীর দ্বারা সংঘটিত শৃঙ্খলা ভঙ্গ জনিত অপরাধের জন্য বেতন বা মজুরী কর্তন করা হয়। তবে মজুরী বা বেতন কর্তন কর্মীর মনোবল হ্রাস করে এবং ব্যবস্থাপনা তখনই এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে যদি চাকুরীচ্যুতি ছাড়া অন্য কোন শৃঙ্খলা বিধানের পথ খোলা না থাকে।

  ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, একজন কর্মীর চাকুরীচ্যুতি হলে তৎক্ষণাৎ তার বিকল্প পাওয়া সমস্যা হয়ে যায়। নুতন কর্মী সংগ্রহ করা যায় কিন্ত তাকে কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অপরদিকে পুরনো কর্মীর মজুরী বা বেতন কর্তন করে তাকে প্রতিষ্ঠানে রেখে দিলে নুতন কর্মী সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের ঝামেলা থেকে প্রতিষ্ঠান বেঁচে যায়। যদি সমস্যা সৃষ্টিকারী কর্মী শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে ফিরে আসে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত আচরণ করে, তবে বেতন বা মজুরী কর্তন ব্যবস্থাটি বাতিল করা হয়। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, যতদিন কর্মী নিজেকে সংশোধন না করছে ততদিন পর্যন্ত তার বেতন বা মজুরী কর্তন চলতে থাকবে এমনকি প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

- ***চাকুরীচ্যুতি (Dismissal)-*** ব্যবস্থাপনা কর্তৃক ব্যবহৃত শৃঙ্খলা বিধান কাজের সর্বশেষ ধাপ হলো সমস্যা সৃষ্টিকারী কর্মীদের চাকুরীচ্যুতি। এই ব্যবস্থাটি সাধারণত মারাত্মক অপরাধের জন্য ব্যবহার করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মীর অপরাধ যখন প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে ব্যহত করে এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হয়, তখন শৃঙ্খলা বিধানের জন্য চাকুরীচ্যুতি একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায়।

  চাকুরীচ্যুতির সিদ্ধান্ত অনেক চিন্তাভাবনা করে প্রদান করতে হয়। অধিকাংশ কর্মীর কাছে চাকুরীচ্যুতি মারাত্মক শাস্তিস্বরূপ গণ্য হয়। যে সমস্ত কর্মীরা একটি প্রতিষ্ঠানে অনেক বছর ধরে কাজ করেন এবং যাদের বয়স পয়তাল্লিশ বছরের উপরে, তাদের পক্ষে চাকুরীচ্যুতির পর নুতন চাকুরী খুজে পাওয়া কষ্টকর। আরেকটি বিষয় ব্যবস্থাপনাকে চিন্তা করতে হয়, তাহলো চাকুরীচ্যুত কর্মী এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। চাকুরীচ্যুত করার আগে তাই ব্যবস্থাপনাকে বিশেণ্ডষণ করে দেখতে হয় যে, অন্য কোন ভাবে অপরাধী কর্মীকে সংশোধন করে আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সম্ভব কিনা।

অনুশীলন
শৃংঙ্খলা বিধানের প্রক্রিয়ার ধাপ অনুসারে ক্রমান্বয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা কি উচিত বলে আপনি মনে করেন? ব্যাখ্যা করুন।

বাংলাদেশে শৃঙ্খলা বিধান সংক্রান্ত আইন
(Disciplinary Action Related Laws in Bangladesh)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অফিস সমূহে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার জন্য 'সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ ১৯৮২' জারী করেন। এই অধ্যাদেশে সরকারী কর্মচারী বলতে সরকারী অফিস, কর্পোরেশন, স্বায়ত্বশাসিত ও আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, বোর্ড, অথরিটি ইত্যাদিতে কর্মরত কর্মচারীদের বুঝানো হয়েছে। তবে মাষ্টার রোলে ও দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী এবং ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনের অধীনে নিয়োজিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ কার্যকরী হবে না। নিচে শুধুমাত্র নিয়মিত অফিসে উপস্থিতি সংক্রান্ত আইনগুলি আলোচনা করা হলো-

- ***বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিতির শাস্তি-*** যদি কোন সরকারী কর্মচারী তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া ছুটিতে যায় অথবা কাজে অনুপস্থিত থাকে, তবে কর্তৃপক্ষ প্রতিদিনের অনুপস্থিতির জন্য একদিনের মূল বেতন কেটে নিতে পারবেন।

  ব্যাখ্যাঃ এই ধরনের বিধান দুইভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। প্রথমত, ছুটির দরখাস্ত দাখিল করে অনুমোদনের আগেই অফিস ত্যাগ, এবং দ্বিতীয়ত, কোন দরখাস্ত না দিয়ে অফিস ত্যাগ। দু'টি ক্ষেত্রেই এই ধারা সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এই ধারায় প্রতিদিনের ঘটনার জন্য একদিনের শুধু মূল বেতন কাটা যাবে, বাড়ি ভাড়া ভাতাসহ অন্যান্য ভাতা কাটা যায় না। যে দিনের বেতন কাটা হবে সেই দিন বিনা বেতনে ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

- ***বিনা অনুমতিতে অফিস ত্যাগের শাস্তি-*** যদি কোন কর্মচারি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অফিস চলাকালীন সময় অফিস ত্যাগ করে, তবে কর্তৃপক্ষ প্রতিবার অফিস ত্যাগের জন্য এক দিনের মূল বেতনের সম-পরিমাণ অর্থ কেটে নিতে পারবেন। এর ব্যাখ্যা হলো, ঘন ঘন কাজের জায়গা পরিত্যাগ করা যাবে না। অফিস চলাকালীন সময়ে কোথাও যেতে হলে গন্তব্য স্থান এবং ফেরার সময় সম্পর্কে পাশের সহকর্মী বা কর্মীকে অবহিত করে যেতে হবে।

- ***দেরীতে অফিসে বা কাজে উপস্থিতির শাস্তি-*** যদি কোন সরকারী কর্মচারী দেরীতে অফিসে আসেন তবে কর্তৃপক্ষ প্রতি দুই দিন দেরীতে উপস্থিতির জন্য এক দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ কেটে নিতে পারবেন।

  ব্যাখ্যাঃ অফিস সময় শুরুর এক মিনিট দেরীতে উপস্থিত হওয়ার জন্যও শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। যানবাহন না পাওয়া, খারাপ আবহাওয়া, সরকারী যানবাহন দেরীতে আসা বা অপরিহার্য ব্যক্তিগত কাজ কোনটিই বৈধ অজুহাত হিসেবে গণ্য হবে না। গুরুতর ও আকস্মিক অসুস্থতার জন্য বিনা অনুমতিতে অফিস ত্যাগের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড ডাক্তারের ডাক্তারী সার্টিফিকেট প্রদর্শন করলে বৈধ অজুহাত হিসাবে গণ্য হবে।

- ***অপরাধ পুনরাবৃত্তির শাস্তি-*** কোন সরকারী কর্মচারী ৩০ দিনের মধ্যে উপরে বর্ণিত তিনটি অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত সাত দিনের মূল বেতনের সমান অর্থ কেটে নিতে পারবেন। অভ্যাসগত অপরাধীদের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপীল) বিধি ১৯৮৫ এর আওতায় বিভাগীয় মামলা করা যাবে।

- ***পুনঃর্বিবেচনার আবেদন-*** কোন সরকারী কর্মচারী এই অধ্যাদেশে উল্লিখিত উপরের চারটি অপরাধের জন্য শাস্তি পেলে ঐ সরকারী কর্মচারী শাস্তির আদেশ পাওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উক্ত আদেশ পুনঃবিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারবেন এবং কর্তৃপক্ষ যথাযথ শুনানীর পর যথাযথ মনে করলে আদেশ পুনঃর্বিবেচনা, বাতিল বা বহাল রাখতে পারেন।

- ***পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ-*** সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ ১৯৮২ -এর কোন বিষয়ে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে পরামর্শের কোন আবশ্যকতা নাই।

- ***আদালতের এখতিয়ার রহিত-*** উল্লিখিত অধ্যাদেশের অধীনে কোন কার্যক্রম বা আদেশের বিপক্ষে কোন দেওয়ানী আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না বা মামলা করা যাবে না।

শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষেত্রে নিজস্ব আইন কানুন রয়েছে। তবে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান আইনের ভিত্তি হিসাবে সরকারী অধ্যাদেশকে গণ্য করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অভিযোগ বলতে কী বুঝায়? অভিযোগের কারণ সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

২. অভিযোগের বৈশিষ্ট্য এবং অভিযোগ পরিচালনার নীতি সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. অভিযোগ পরিচালনার পদক্ষেপ বর্ণনা করুন।

৪. শৃঙ্খলা বা শৃঙ্খলা বলতে কী বুঝায়? শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সমস্যার ধরন ব্যাখ্যা করুন।

৫. একটি প্রতিষ্ঠানের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য কি কি কারণ দায়ী বলে আপনি মনে করেন? ব্যাখ্যা করুন।

৬. বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কারণসমূহের সমাধানের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

৭. শৃঙ্খলা বিধানের কয়টি মতবাদ রয়েছে? কি কি? ব্যাখ্যা করুন।

৮. কোন্ প্রতিষ্ঠানের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সমাধান করা হয়ে থাকে? বর্ণনা করুন।

৯. শিল্প প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য বাংলাদেশে কি কি আইন অনুসরণ করা হয়? লিখুন।

১০. 'শৃঙ্খলা বিধানের উদ্দেশ্য শাস্তি প্রদান করা' এ কথার সঙ্গে কি আপনি একমত? মতামত ব্যাখ্যা করুন।

নমুনা প্রশ্ন

কোর্স কোড : **BBS MGT 3507**

সময় : ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান: ৮০

(ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক)

ক-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্ন

(যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন) ১২×৫=৬০

১। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি আলোচনা করুন। ৩+৯=১২

২। জনশক্তি পরিকল্পনা কি? এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৩+৯=১২

৩। কার্যবিশ্লেষণ কি? কার্য বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। ৩+৯=১২

৪। জনশক্তি সংগ্রহ কি? জনশক্তি সংগ্রহের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। ৩+৯=১২

৫। সাক্ষাৎকারের সংজ্ঞা দিন। এর পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন। ৩+৯=১২

৬। প্রশিক্ষণের সংজ্ঞা দিন। প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। ৩+৯=১২

৭। কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন বলতে কি বোঝেন? কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের পদ্ধতি আলোচনা করুন। ৩+৯=১২

৮। অভিযোগ পরিচালনা কি? এর নীতিমালা ও পদক্ষেপ বর্ণনা করুন। ৩+৯=১২

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

(যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন) ৪×৫=২০

৯। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে কি বোঝেন?

১০। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও কর্মী ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য দেখান।

১১। জনশক্তি পরিকল্পনার উপাদান বর্ণনা করুন।

১২। পদ মূল্যায়ন বলতে কি বোঝেন?

১৩। জনশক্তি সংগ্রহনের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।

১৪। নির্ভরযোগ্যতার সংজ্ঞা দিন।

১৫। সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

১৬। পরিমিত চেক লিষ্ট পদ্ধতি কি?